শূদ্রমুক্তির পথ

পেরিয়ার ই. ভি. রামস্বামী

অনুবাদক :
শেখ নাসীর আহমদ

সূচীপত্র

১। প্রকাশকের কথা — ১

২। লেখক পরিচিতি — ২

৩। ভূমিকা — ৫

৪। জাতিগত লাঞ্ছনা থেকে
মুক্তির সর্বোত্তম পথ ইসলাম — ৯

৫। আমাদের অবশ্যই ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে ১৬

৬। স্বাধীন ভারতে দ্রাবিড়রা ক্রীতদাস ২২

৭। কেন ইসলাম গ্রহণ করবেন — ২৪

প্রকাশকের কথা

ভারতের জনসাধারণের দুর্ভাগ্য এই যে, তারা তাদের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের রচনাবলীর সাথে সম্যক পরিচিতি নয়। ভাষাগত ব্যবধান এক্ষেত্রে মস্ত বাধা। অনুবাদের মাধ্যমে এ বাধা দূর করা যেতে পারে। এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম তামিল মনীষী ও শিক্ষাবিদ পেরিয়ার ই, ভি, রামস্বামী নাইকারের চিন্তাধারার সাথে আমরা ভাষাগত কারণে পরিচিত নই। ব্যাঙ্গালোরস্থ দলিত সাহিত্য একাডেমি ১৯৮৬ সালে তাঁর এক রচনার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করে। অনূদিত পুস্তকটির নাম 'The Salvation to Shudra Slavery.' এটি আসলে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে প্রদত্ত এই ভাষণ অর্থগতাদী পূর্বে যেমন প্রাসংগিক ছিল আজও তেমনি প্রাসংগিক রয়েছে বরং সমসাময়িক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রাসিংগকতা ও গুরুত্ব আরও বেড়েছে। এ সব দিক বিবেচনা করে আমরা এই ইংরেজী পুস্তকের বংগানুবাদ প্রকাশ করেছি। অনুবাদ করেছেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র (বঙ্কিম চন্দ্র মেডেল. ডি. এল, রায় স্কলারসিপ, মধুসূদন প্রাইজ, কামিনী সুন্দরী প্রাইজ প্রাপ্ত) প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেংক নাসীর আহমদ সাহেব। পুস্তকের শেষাংশ যা পেরিয়ারের রচনা নয় বরং ইংরেজী অনুবাদকের রচনা তা বহুল্য বিবেচনায় আমরা বাদ দিয়েছি।

ইতি—

প্রকাশক

॥ লেখক পরিচিতি ॥

পেরিয়ার ই, ভি, রামস্বামী নাইকার বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারত সন্তান। তামিল ভাষায় পেরিয়ার শব্দের অর্থ হলো'মহামানব'। তিনি এখনও তামিলনাড়ুর প্রবাদ পুরুষ। তিনি ভারতের অভিশাপ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সবচাইতে শক্তিশালী অব্রাহ্মণ আন্দোলন দ্রাবিড় কাজাঘাম আন্দোলনের জনক। তিনি ভারতের বৃহত্তর জনসাধারণ শূদ্রদের (যাদের সংখ্যা মোট জনতার ৫২%) মধ্যে যে দাসমনোভাব বিরাজ করছে তা দূর করে তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগাবার জন্য আমরণ চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর ত্যাগ ও কোবরানীর ফলেই ভারতে প্রথম অব্রাহ্মণ শাসন কায়েম হয়। তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য অসাধারণ বাগ্মী আন্নাদুরাই ১৯৬৭ সালে ব্রাহ্মণ্যশাসন থেকে তামিলনাড়ুকে মুক্ত করেন। স্বাধীনতার নামে বৃটিশকে তাড়িয়ে ভারতে মনুষ শাসন কায়েম করার ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি গান্ধীজী অথবা বৃটিশ কারো ফাঁদে পা দেননি। ১৯৪০ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী

বানাতে চেয়েছিলেন। তখন তামিলনাড়ুকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি বলা হতো এবং প্রাদেশিক সরকার প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী বলা হতো। নতুন ভারতশাসন আইন অনুযায়ী সে সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ফজলুল হক, স্যার নাজিমুদ্দিন ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী। কিন্তু এ ধরনের লোভনীয় পদকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। স্বরাজের আগে আত্মসম্মান প্রয়োজন একথা তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মুখের উপর বলে দেন। এই শূদ্রনেতা এই বলে কংগ্রেস ত্যাগ করেন যে এটা দেশের প্রধানতম ব্রাহ্মন্যদল। তিনি হিন্দী ভাষার বিরোধী ছিলেন কারণ তা আর্য্য প্রাধান্যের দ্যোতক। তিনি পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন কারণ এটা ছিল তাঁর কাছে ব্রাহ্মণদের ছলনার ফাঁদ। ব্রাহ্মণ্যজুলুম থেকে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাঁর দলীয় সদস্যদের শোকের নিদর্শন হিসাবে কালো পোষাক পরিধান করতে বলেন। তাঁর কাছে হিন্দুধর্ম ছিল শূদ্র ও অচ্ছুতদের দাসত্বের কারণ।

চিন্তাবিদ ও সমাজসংস্কারক হওয়ার সাথে সাথে তিনি ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ বক্তাও। তিনি ১০ হাজার ৭০০ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তামিলনাড়ুর প্রত্যেক অব্রাহ্মণ নেতা তাঁর কাছে ঋণী। আন্নাদুরাই থেকে করুণানিধি পর্য্যন্ত তামিলনাড়ুতে যেসব অব্রাহ্মণ নেতার উদ্ভব হয়েছে তা তাঁরই প্রচেষ্টার ফল। সংস্কৃতের থেকেও প্রাচীন তামিল ভাষাকে তিনি ভারতীয় ভাষার মধ্যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ভাষায় তিনি এক দৈনিকও চালাতেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক মূর্ত প্রতিবাদ। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর থেকে বড়মাপের নেতা এ পর্যন্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করেননি। এ ব্যাপারে ডা: আম্বেদকরের আসন তাঁর নীচে, তাঁর উপরে নয় কারণ ডাঃ আম্বেদকর পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এজন্যে তিনি বারেবারে তাদের

চাপের কাছে নতিস্বীকার করেন এবং প্রতারিত হন। কিন্তু পেরিয়ার এ ভুল করেননি কারণ তাঁর দূরদর্শিতা ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি বুঝেছিলেন ইসলাম ছাড়া সব ধর্মই তা খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ যাই হোক না কেন কমবেশী ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত। তিনি একবার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন কিন্তু রেংগুনে বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগদান করে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কুসংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানপ্রিয়তা লক্ষ্য করে তিনি সে সংকল্প ত্যাগ করেন। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে তিনি কিছুই বলেননি বরং ১৯৪৭ সালে তিনি তার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। যে কারণে এম. এন. রায়, বার্ণর্ড শ ইসলামের উত্থানকে মানবতার উত্থান বলে মনে করতেন ঠিক সেই একই কারণে তিনি ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যে-কারণে পূর্বোক্ত মনীষীগণ ইসলাম কবুল করতে পারেননি তিনিও ঠিক সেই একই কারণে বহুলোকের ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েও ইসলামের বাইরে রয়ে গেলেন।

তিনি ছিলেন এ যুগের আবুতালেব। ১৯৭০ সালের ২৬শে জুন ইউনেস্কো তাঁকে নিম্নভাষায় সম্মান জানায়, 'পেরিয়ার নয়া যামানার ত্রাণকর্তা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সক্রেটিস। সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের জনক, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অর্থহীন কুপ্রথা ও ভিত্তিহীন রীতিনীতির ভয়ংকর দুশমন।' এই মন্তব্যের মধ্যে এতটুকুও অতিশয়োক্তি আছে ব'লে মনে হয়না।

ভূমিকা :

তামিলনাড়ুর বাইরে এবং বিশেষত উত্তর ভারতে পেরিয়ার ই, ভি, রামস্বামী সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায় অথচ ভারতে সামাজিক বিপ্লব আনয়নের ক্ষেত্রে তাঁর স্থান কেবলমাত্র বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের পরেই। এটার কারণ হলো তিনি যাকিছু লিখেছেন ও বলেছেন তা তামিল ভাষাতেই, ইংরেজীতে নয়। সেজন্য তার প্রভাব কেবলমাত্র তামিলভাষী জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। দেশের কল্যাণের জন্য তাঁর বিশাল রচনাভাণ্ডার তামিল থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত নগণ্য।

এই মহান বিপ্লবীকে বিশ্বের কাছে, শূদ্রদের কাছে বিশেষত অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর কাছে পরিচিত করে তোলার জন্য দলিত সাহিত্য একাডেমীর এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

স্বাধীন ভারতের তিনজন সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের মধ্যে ডঃ আম্বেদকরের স্থান প্রথম, পেরিয়ারের (যার অর্থ মহামানব) স্থান দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান হচ্ছে ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত এতবড় বিপ্লবীর যিনি তামিলনাড়ুতে শূদ্ররাজের ভিত্তিস্থাপন করেছেন এবং এর বাইরে লক্ষ লক্ষ লোককে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁর ভালো একটা ইংরেজী জীবনীও আমাদের নেই। পেরিয়ারের উপর একমাত্র ভাল বই হচ্ছে বিদেশী লেখক Anita Dieheb একজন খৃষ্টান মহিলা (বি, আই, পাবলিকেশানস, ৫৪ জনপথ, নয়াদিল্লী ১১০০০১, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ১৪৫, মূল্য—২৫·০০)।

এই বই প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হলো ভারতের বিশাল দাস জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা যে পেরিয়ারের স্বপ্ন সফল হয়নি যিনি জঘন্য অত্যাচার থেকে এই দাসদের মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম ও জীবনপাত করেছিলেন।

এটা এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা যা পেরিয়ার ঠিক দেশ স্বাধীন হবার প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালে দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতায় পেরিয়ার তাঁর অন্তরের অন্তস্থলের চিন্তাকে ব্যক্ত করেছেন। জাত ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের পরেই যাদের স্থান সেই শূদ্রদের দুঃখজনক অবস্থায় তিনি গভীর উদ্বেগবোধ করেছেন। দক্ষিণ ভারতে মাঝের দুটো বর্ণ না থাকায় শূদ্রদের স্থান অচ্ছুতদের উপরে হলেও ব্রাহ্মণদের পরেই। এই শূদ্ররা হলো হিন্দুদের মধ্যে সর্ব্বাধিক—হতে পারে তাদের সংখ্যা মোট হিন্দু জনতার ৭০%। ১৯৪৭ সালে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। পেরিয়ার নিজেই ছিলেন এক শূদ্র জাতভুক্ত (দ্রাবিড়)।

কিন্তু পেরিয়ারের বক্তৃতার ৪০ বছর পরও আজ শূদ্রদের অবস্থা কি? এমনকি পেরিয়ারের নিজের রাজ্য তামিলনাড়ুতেই তাদের অবস্থা মন্দ থেকে মন্দতর হচ্ছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে তাদের কথা না বলাই ভালো। অচ্ছুত (সরকারী নামে সিডিউল্ড কাষ্ট) উপজাতি প্রভৃতির নামকাওয়াস্তে হলেও সাংবিধানিক 'সংরক্ষণের' অধিকার রয়েছে এবং এই কারণে কেবল সংখ্যার জোরে মর্যাদায় না হলেও তাদের স্থান ব্রাহ্মণদের পরেই। কিন্তু শূদ্রদের (সরকারী নাম অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী বা ওবিসি'দের) কিছুই নেই। তারা ব্রাহ্মণ ও দলিতদের মাঝে পৃষ্ট হচ্ছে। হতে পারে

দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলি তাদের কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ওবিসিদের জন্য কিছু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু সারা উত্তর, উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে ওবিসিদের জন্য কোন ক্ষেত্রেই কোন ভূমিকা নেই। ১৯৮০ সালের মণ্ডলকমিশন রিপোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরীতে ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করা হলেও কার্যতঃ তাকে বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করা হয়েছে। (১৯৯০ সালে মণ্ডল কমিশন রিপোর্ট মেনে নেওয়ায় ব্রাহ্মণবাদীরা ভি. পি. সিং-এর নেতৃত্বাধীনে জনতা সরকারকেক্ষমতাচ্যুৎ করেছে—অনুবাদক)। কাজেকাজেই বহু ব্যাপারে শূদ্রদের অবস্থা দলিতদের থেকে খারাপ। অনেক শূদ্রই দলিত ও আদিবাসীদের তুলনায় গরীব না হলেও গরীব।

কিন্তু এই গরীবী ও বঞ্চনা সত্ত্বেও শূদ্ররা তাদের ঔদ্ধত্য পরিহার করেনি। সারা ভারতে এই ওবিসিরাই অচ্ছুত, এমনকি মুসলিম, খৃষ্টান ও শিখেদের বিরুদ্ধে হামলায় তাদের দৈহিক শক্তির ব্যবহার করছে। শূদ্ররা ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করলেও ব্রাহ্মণ্যবাদকে কিন্তু ভালবাসে। ভারতের সমস্যা হচ্ছে এই শূদ্রদের সমস্যা (১৯৮৪ সালের ১৬ই মে ও ১৯৮৩ সালের ১লা ডিসেম্বরের Dalit Voice-এর সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য)।

দলিত এবং আদিবাসীদের একজন নিজস্ব নেতা ও দর্শন আছে (আম্বেদকরবাদ) কিন্তু শূদ্রদের কিছুই নেই। দলিতদের অন্ততঃ জংগী গোষ্ঠীগুলি ঘোষণা করেছে যে তারা হিন্দু নয় কিন্তু শূদ্রদের ব্যাপারে একথা বলা যায় না বরং তারা গর্ব করে বলে চলেছে তারা হিন্দু যদিও ঐতিহাসিকভাবে দেখলে তারা হিন্দু নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ

যা আর্য আক্রমণকারীরা এদেশে এনেছিল তার প্রচলিত নাম হচ্ছে হিন্দুধর্ম। যেহেতু শূদ্ররা আর্যপূর্ব জাতি সেহেতু তারা হিন্দু হতে পারে না।

এ বছরের প্রথম ভাগে দিল্লীতে এক আলোচনা চক্রে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, উত্তর ভারতের এক বড় শূদ্রনেতা কর্পুরী ঠাকুরের সামনে আমরা দুটো প্রশ্ন রেখেছিলাম : (১) শূদ্রদের নেতা কে? (২) শূদ্রদের দর্শন কি? কিন্তু তিনি কোন জবাব দিতে পারেননি। আমরা যখনই শূদ্রদের সাথে সম্মিলিত হই সেখানেই এই প্রশ্ন রাখছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এ ব্যাপারে কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি। ব্রাহ্মণ্যবাদ বা হিন্দুবাদের প্রতি তাদের অনুরক্তি কাটিয়ে উঠতে না পারার জন্যই শূদ্ররা ভুগছে। তারা নিজেরাই তাদের উভয় সংকটের ফাঁদে পা দিয়েছে। এ ধরনের এক আভ্যন্তরীণ সংঘাত তাদের কেসকে বিপর্যস্ত করেছে এমনকি ব্রাহ্মণ ও বানিয়ারা তাদের একদিকে দলিতদের বিরুদ্ধে অন্যদিকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে লেঠেল হিসাবে ব্যবহার করছে।

যদিও আমাদের প্রাথমিক ভাবনা দলিতদের নিয়েই তৎসত্ত্বেও শূদ্রদের মুক্তির ব্যাপারেও আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। কারণ আমরা জানি দলিত ও অন্যান্য নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা ততদিন পর্যন্ত সুখী হতে পারে না যতদিন এক বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠী নির্যাতিত হতে থাকবে। সেজন্য আমরা শূদ্রদের মুক্তির ব্যাপারে তীক্ষ্ণভাবে আগ্রহী এবং এজন্যই এই বই—সম্ভবত শূদ্রদের সম্পর্কে প্রথম—কেবলমাত্র তাদের এ ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য যে, তাদের নির্বুদ্ধিতাই তাদের ধ্বংস করছে। শূদ্রেরা জীবনের উদ্দেশ্যই জানে না।

পেরিয়ার ভারতের প্রথম শূদ্র ব্যক্তি যিনি শূদ্রদের সাংঘাতিক অবস্থা সার্বিকভাবে উপলব্ধি করেন। ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের ঘৃণা করে কিন্তু সেই সঙ্গে দলিত ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে আক্রমণে তাদের ব্যবহার করে। এই কারণেই দলিত ও সংখ্যালঘুরা তাদের শত্রু মনে করে। এভাবে শূদ্ররা উভয় সংকটের শিকার। তারা বাঁচেও না, মরেও না।

শূদ্রদের এই দুঃখজনক অবস্থার কারণ প্রধানত তাদের নিজেদের হিন্দু হিসাবে চিন্তা করা। প্রকৃতপ্রস্তাবে তারা ব্রাহ্মণদের থেকে হিন্দুধর্মের বেশী অনুসারী। পেরিয়ার দূরদর্শিতা সহকারে ত্রুটী উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিন্দুধর্ম শূদ্রদের কোণঠাসা করে ফেলবে।

আরো এক শূদ্রনেতা মহারাষ্ট্রের মহাত্মা ফুলে শূদ্র জাগরণে বিরাট অবদান রেখেছেন, অবদান রেখেছেন কেরালার নারায়ণ গুরু কিন্তু তাদের চিন্তাধারা পেরিয়ারের মত তীক্ষ্ণ নয়।

পেরিয়ারই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, শূদ্রদের যতদিন হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা না যাচ্ছে ততদিন তাদের মুক্তি নেই। শূদ্ররা তাদের সংগ্রামে ব্যর্থ হচ্ছে এমনকি মণ্ডল কমিশনের ব্যাপারেও ব্যর্থ হচ্ছে তাদের হিন্দুধর্মের জন্য। দলিতরা হিন্দু নয় এই ঘোষণার কারণেই ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর সফল হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণরা শূদ্র ও দলিতদের সংঘাতকে কাজে লাগায় যাতে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রামে লিপ্ত থাকে এবং দুজনের কেউই ব্রাহ্মণের চালাকী ধরতে পারছে না। তারা সারা ভারতে দলিতদের বলে বেড়াচ্ছেন যে ব্রাহ্মণরা তাদের উপর হামলা করছে না, হামলা

করছে শূদ্ররা (OBC) এবং এটা ঘটনা। এভাবে তারা দলিতদের শূদ্রদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। ব্রাহ্মণ বানিয়ারা ওবিসিদের বলে তারা কোথাও সংরক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে না কারণ সিডিউল্ড কাষ্টরা তাদের সব চাকরী নিয়ে নিচ্ছে।

এজন্যেই পেরিয়ার শূদ্রদের হিন্দু গোলামখানা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইসলামের ন্যায় সাম্যবাদী ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আফসোস তিনি ব্যর্থ হন। শূদ্র আন্দোলন শুধু তামিলনাড়ুতেই নয় বরং সারা ভারতেই ব্যর্থ।

পেরিয়ার শূদ্রদের ইসলাম গ্রহণ করাতেই শুধু ব্যর্থ হননি এমনকি তিনি তামিলনাড়ুর শূদ্রদের মন থেকে মুসলিম বিদ্বেষ দূর করতেও সমর্থ হননি। বীরমনির নেতৃত্বে তার নিজস্ব দল দ্রাবিড কাজাঘাম ছাড়া পেরিয়ারের অনুসারীরা ব্রাহ্মণের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ার জন্য পর স্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করছে।

পেরিয়ারের পয়গাম জনপ্রিয় হয়নি কারণ তাঁর স্ট্রাটেজী ব্রাহ্মণদের দ্বারা মগজধোলাই করা শূদ্রদের দ্বারা সমাদৃত হয়নি। তাঁর নিরীশ্বরবাদী বক্তৃতাগুলোও শূদ্র জনসাধারণ গভীর শ্রদ্ধার সংগে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে বাস্তবায়িত করেনি। শ্রেণীর থেকে জনতা স্বতন্ত্র। জনতা খোঁড়ার মত লাঠি ছাড়া চলতে পারে না। অশিক্ষিত নিরক্ষর জনতার জন্য ভারতে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ। শত শতাব্দী ধরে ব্রাহ্মণদের মগজধোলায়ের ফলে অবার ধর্মভয় তাদের হৃদয়ে গাঁথা হয়ে গেছে। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলা যেতে পারে। পেরিয়ার তা জানতেন কিন্তু তিনি কাঁটা ব্যবহার করেননি। এই কারণেই বাবাসাহেবের হিন্দুধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধধর্ম

গ্রহণের স্ট্রাটেজী বাস্তবে সফল প্রমাণিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক বাবাসাহেবের অনুসরণে অন্তত মহারাষ্ট্রে বৌদ্ধ হয়েছে যেখানে বৌদ্ধরা শক্তিশালী। পেরিয়ারের উচিত ছিল তার বিশ্বাসকে যুক্তিসংগত পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া। যখন তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইসলামই শূদ্রমুক্তির একমাত্র পন্থা তখন তাঁর দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত ছিল। তাহলে লাখ লাখ লোক তাঁকে অনুসরণ করতো এবং আরও অনেক অনেক লাখ লোককে তিনি এপথে যাওয়ার জন্য চিন্তান্বিত করতে পারতেন। আজ তামিলনাড়ু আবার ব্রাহ্মণদের দখলে এবং শূদ্ররাই ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। জনতা তেমন সরকারই পায় যেমন সরকারের তারা উপযুক্ত।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পেরিয়ার ইসলাম সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা অসত্য এবং শূদ্রদের শূদ্রত্ব খতম করতে ইসলামের ক্ষমতা ভোঁতা হয়ে গেছে। পেরিয়ার যে দূরদ্রষ্টা ছিলেন মীনাক্ষীপুরমে দলিতদের গণধর্মান্তরের ঘটনা সারা দেশকে না হোক তামিলনাড়ুকে কাঁপিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছে। কিন্তু নিয়তির পরিহাস এই যে, শূদ্র নয়, দলিতরা তাঁর নীতির অনুসরণ করেছে শূদ্রদের দ্বারা উত্যক্ত হয়েই। তামিলনাড়ুর শূদ্ররা গর্বভরে পেরিয়ারকে তাদের নেতা বলে উল্লেখ করে। অচ্ছুতদের মধ্যে পেরিয়ার সম্পর্কে এই উৎসাহ দেখা যায় না (Periyer E. V. Ramaswamy—Page 53) কিন্তু তৎসত্ত্বেও মীনাক্ষীপুরম ও অন্যান্য স্থানে তারাই তাঁর প্রেসক্রিপসান গ্রহণ করেছে ও রোগ সারিয়ে নিয়েছে কিন্তু তাঁর নিজের জাতি, তাঁর অনুসারী হওয়ার দাবীদাররা এমনটা করেনি।

জনগনকে, তাদের প্রতিশ্রুতিকে যাচাই করার জন্য ইতিহাসের পথ বড় বিচিত্র।

ইসলাম ধর্মান্তরিত দলিতদের আত্মমর্যাদা দান করেছে কিন্তু তাজ্জবের ব্যাপার দলিতদের ইসলামে ধর্মান্তরের বিরোধীদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে রয়েছে শূদ্ররা। একজন শূদ্রই তামিলনাড়ুতে হিন্দু নাৎসী দলের নায়ক। আবার শূদ্ররাই দলিতদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে এবং তারাই কন্যাকুমারী জেলায় পুলিশের গুলিতে খৃষ্টানদের গণহত্যার জন্য দায়ী। পেরিয়ার যদি জীবিত থাকতেন তাহলে শূদ্র আন্দোলনের এই পতন ও ধীর মৃত্যুর জন্য মর্মবেদনা অনুভব করতেন। তারা পেরিয়ারের অনুসারী তাদের এই দাবীর ব্যাপারে আমাদের শূদ্রনেতাদের গভীর ভাবে চিন্তা করা উচিত।

যাই হোক পেরিয়ারের পুরোনো উত্তম বক্তৃতা প্রকাশ করে আমরা তামিলনাড়ু ও দেশের অন্যান্য অংশের শূদ্রদের তাদের করুণ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। শূদ্ররা তাদের কাম্য সুযোগ-সুবিধার মালিক হবে যখন তারা বলতে পারবে যে তারা হিন্দু নয়। তাদের পছন্দসই ধর্মের ব্যাপারটা এক এক স্থানে এক এক রকম হতে পারে কিংবা তারা পেরিয়ারের মত কোন ধর্মছাড়া যুক্তিবাদীও থেকে যেতে পারে কিন্তু তাদের পছন্দ যাই হোক হিন্দুধর্ম ছাড়ার কাজে দেরী করা উচিত নয়। শুধু যে শূদ্রদের স্বার্থেই এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন তা নয় বরং দলিত, সংখ্যালঘু তথা সমগ্র দেশের সুখ শান্তির স্বার্থেও এটা বেশী জরুরী।

পেরিয়ার দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন কারণ তিনি তাঁর জাতিকে শূদ্রত্ব মুক্ত করতে পারেননি। সারা ভারতে শূদ্ররা

এবং অন্য কেউই পেরিয়ার যা বলেগেছেন তা সহজে খারিজ করতে পারেন না কারণ তিনি কোন সাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্ব, মহামানব এবং তিনিই রোগের মূল ধরতে পেরেছিলেন এবং নিরক্ষর জনসাধারণ হিন্দুধর্ম ছেড়ে দেওয়ার দাওয়াই সুপারিশ করেছিলেন। এমনকি তার বক্তৃতার ৪০ বছর পরেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি এবং কোন পরিবর্তনও হবে না যতদিন পর্যন্ত শূদ্ররা এই অমানবীয় ধর্মের সাথে সংযুক্ত থাকবে। এই কারণে তার বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে এবং সামাজিক বিপ্লব সম্পর্কে আগ্রহী সকল ভারতীয় কর্তৃকই তা গভীরভাবে পর্যালোচনার দাবী রাখে।

এই ভাষণ মুসলমানদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা তাদের ভাবিয়ে তুলবে যে, পেরিয়ার ই, ভি, রামস্বামীর মত মহান বিপ্লবী কিভাবে ইসলামকে এবং হিন্দুধর্মের চোয়ালে ধৃতদের মুক্তির ব্যাপারে এর শক্তি সামর্থকে পর্যালোচনা করেছেন যখন প্রচার মাধ্যম দেশের মধ্যে মজুদ মুসলিম-বিদ্বেষকে উস্কে চলেছে তখন পেরিয়ার, এম, এন, রায়ের মত বিপ্লবী এবং অন্যান্যদের ইসলামের সাম্যবাদী জীবন ব্যবস্থার প্রতি প্রদত্ত গৌরবময় অভিমত মুসলমানদের ভগ্নবুককে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে।

অধ্যাপক এ, এম, ধর্মলিংগম নিজে একজন ওবিসি এবং যুক্তিবাদী এবং তিনি পেরিয়ারের একজন ঘনিষ্ট সহযোগীও। তিনি তাঁর এই বক্তৃতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন।

এই অনুবাদ তাঁর তামিলে প্রদত্ত ভাষণ থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছে মাদ্রাজের দ্রাবিড় কাজাগাম। ঘটনাসমূহের যাথার্থ বিচারে এবং অনুবাদে সাহায্য করার জন্য আমরা ব্যাঙ্গালোরের আরবী কলেজের তামিল মুসলিম পণ্ডিত এবং পেরিয়ারের একনিষ্ঠ ভক্ত মৌলনা নয়া রব্বানীকেও ধন্যবাদ জানাই।

ব্যাঙ্গালোর,
সেপ্টেম্বর, ১, ১৯৮৬।

ভি, টি, রাজশেখর

জাতিগত লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির সর্বোত্তম পথ ইসলাম

[১৯৪৭ সালের ১৮ই মার্চ দক্ষিণ ভারত রেলওয়ে কর্মচারী সমিতি ত্রিচুরপল্লীতে (তামিলনাড়ুতে) রেলওয়ে কর্মচারীদের পক্ষ থেকে ১০৮০ টাকার এক তহবিল ও স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। এই স্মারকলিপিতে দ্রাবিড় কর্মচারীরা পেরিয়ারের কাছে তাদের অভিযোগের তালিকা পেশ ক'রে তার প্রতিকার প্রার্থনা করে। কর্মচারী সমিতির অনুরোধ কমরেড টি, পি ভেদাচলম পেরিয়ারের হাতে স্মারকলিপি প্রত্যার্পণের পূর্বে কর্মচারীদের অভিযোগগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করেন। প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ এই সমাবেশে যোগদান করে। এই সমাবেশে পেরিয়ার যে ভাষণ দান করেন তা নিম্নরূপ :—

প্রিয়সাথী ও বন্ধুগণ,

দ্রাবিড়-কাজাঘাম ফাণ্ডের জন্য যে তহবিল আমাকে প্রদান করেছেন তার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনাদের স্মারকলিপি পড়েছি। প্রেসিডেণ্ট ভেদাচলম অত্যন্ত বিষদভাবে ব্যাপারটি তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষণ থেকে আমি অনেক জিনিস জানতে পেরেছি। আপনারা ছ'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন যার মধ্যে ৫ ও ৬ নং খুবই মূল্যবান। বিষয়গুলো এই :—

১) কর্মচারী বাছাই কমিটি।

২) বাছাইয়ের পদ্ধতি।

৩) মাইনে।

৪) প্রমোশন।

৫) আপনাদের প্রতি ব্যবহার।

৬) গুরুত্বপূর্ণ পদে বর্ণবাদীদের সংখ্যাধিক্য।

নিয়োগ কমিটি

নিয়োগ কমিটির কথা বলতে গেলে শরীর কেঁপে ওঠে এবং খুন টগবগ করে ফুটতে থাকে। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য যেভাবে লোক বাছাই করা হয় তা স্বরাজের অধীনে কোন পাগলের দ্বারাও করানো যেত না। আমাদের দেশে রেলওয়ে হচ্ছে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের সাধারণ সম্পত্তি। প্রত্যেকের নিযুক্ত হবার অধিকার রয়েছে। এই কারণে কমিটিতে সকল গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর অবশ্যই প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত যেহেতু এটাই যথার্থ ও ন্যায্য। এমনকি যদি একটি বা দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নাও থাকে তাহলে জনতার ৮০ অথবা ৯০% প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু তার পরিবর্তে যাদের জনসংখ্যা মাত্র কোনক্রমে ৩%, দেখা যাচ্ছে যে কমিটিতে তাদেরই একাধিপত্য। যারা অন্যদের ছোট জাত হিসাবে দেখে এবং লোকদের হেয় করে তারা কমিটিতে থাকার অনুপযুক্ত। জাতিভেদ যা দেশের সর্বাধিক ক্ষতি করেছে এবং করে চলেছে তাকেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে একচেটিয়া প্রাধান্য করতে দেখা যাচ্ছে। এটা ঔদাসীন্য ও সাধারণ জনতার উপর জুলুম ছাড়া কিছুই নয়। এর অর্থ কি এই নয় যে সরকার জনতার কল্যাণের ব্যাপারে আগ্রহী নয় বরং জনতা শাসক শ্রেণীর দাম্ভিকতা, জুলুম ও স্বার্থপরতার শিকার ?

কমিটির সদস্য

রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের স্বরূপটা দেখুন। এই কমিশন **S. I. R** এবং **M. S. M.** এই উভয়বিভাগের জন্য নিয়োগ করে থাকে। সদস্যগণ হলো ঃ—

১) রাও বাহাদুর আর মাধবাচারিয়ার, চেয়ারম্যান (আয়েঙ্গার)।

২) রাও বাহাদুর এম, রামচন্দ্র আয়ার,

৩) টি, কে সুন্দরাজ আয়েঙ্গার,

৪) খান বাহাদুর আব্দুল করিম।

৫) কমরেড কে, সুন্দরাজ (আয়ার)।

পাঁচজনের মধ্যে চারজন ব্রাহ্মণ। একজন মুসলমান। তিনি আবার তিন-চতুর্থাংশ ব্রাহ্মণ এবং এক-চতুর্থাংশ মুসলিম। আব্দুল করিম ব্রাহ্মণ্য থিওসফি সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত। তিনি এক ব্রাহ্মণ মহিলাকে বিয়ে করেছেন। এটাও জানা গেছে মহিলাটি চেয়ারম্যানের আত্মীয়। অধিকন্তু তিনি ডাঃ টি, এস, এস রাজনের সংভাই বলা হয়। ব্রাহ্মণ কর্তৃক দ্রাবিড় দলনে রাজনের স্থান কেবমাত্র সাম্মনমের পরেই। কমিটির এই প্রকৃতি দেখার পর কেউ কি কল্পনা করতে পারে যে অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতি কোন সুবিচার হবে? কমিটির এই গঠন কাঠমোতেই স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে যায় স্বরাজ সরকারের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ।

এর পরে আসে মাইনের প্রশ্ন। পদকে ভাগ করা হয়েছে উচ্চ, আরামদায়ক ও লাভদায়ক হিসাবে। নীচু পদ কঠিন শ্রম দাবী করলেও সে পদের কোন ক্ষমতা নেই এবং মাইনেও অল্প। ব্রাহ্মণদের উচ্চপদে নিয়োগের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালান হয়। নীচু পদের কর্মচারীকে জীবনধারণোপযোগী অর্থও দেওয়া হয় না। মন্ত্রীরা যারা ৫০০ টাকা পেতেন এখন তারা ১৫০০ টাকা পান। সফরে বেশীরভাগই পরের বাড়ীতে খান এই উচ্চপদের কর্মচারীরা। এভাবে তারা মাইনের টাকা জমান। কংগ্রেস এম, এল, এ-রা যারা ৭৬ টাকা মাইনে পেতেন এখন তারা ১৫০ টাকা পান। লাইসেন্স প্রদান, চাকরীপ্রদান, মামলা প্রত্যাহার ইত্যাদির দ্বারা, মন্ত্রীদের সাহায্যে এম, এল, এরা কমিশনের মাধ্যমে মোটা টাকা কামান। এর উপর আছে সেলামী ও উপহারের দক্ষিণা। যেসব লোক এম, এল, এ

হবার আগে বাড়ী ভাড়া দিতে পারতো না এখন তারা বিরাট সম্পত্তির মালিক এবং লক্ষ্মীর বরপুত্র হিসাবে বিলাসবহুল গাড়ীতে যাতায়াত করেন। এই লোকদের বিপরীতে রয়েছে গরীবরা, স্বল্প বেতনের শ্রমিকরা যারা তাদের ছেলেদের শিক্ষা ও পুষ্টিকর খাদ্য যোগাতে অক্ষম। এটা কি মনুর সরকার নয় ?

নিয়োগ কৌশল

সরকারী পদে নিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই রাজ্যে জনতার মধ্যে বিভিন্ন জাতের লোকের সংখ্যানুপাতে চাকরীর বণ্টন হওয়া উচিত। মিনিমাম যোগ্যতা থাকলে জনসংখ্যানুপাতে সকলের চাকরী পাওয়া উচিত। কিন্তু সরকার কর্তৃক লোক বাছাই ও নিয়োগ হচ্ছে অত্যন্ত পক্ষপাতমূলক ও অন্যায্যভাবে। সমস্ত উচ্চপদের জন্য ব্রাহ্মণদের বাছাই করা হয়। যদি প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় তাহলে সাহেবকে নিয়োগ করা হয় কিংবা অন্য রাজ্য থেকে লোক নির্বাচন করা হয়। এছাড়া প্রায়ই খৃষ্টান মুসলিম, মঙ্গোলিয়ান অথবা মালয়ীকে সুযোগ দেওয়া হয় কদাচিৎ। যখন তামিলকে নিয়োগ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয় যাতে পদটাই তুলে দেওয়া হয়। আমি এটা খুব ভালভাবেই জানি।

উচ্চপদ প্রদানের ব্যাপারে বর্তমান সরকার সাম্প্রদায়িক জি, ও,-কে ব্যবহার করছেন উদাসীনভাবে। হাইকোর্ট, কালেকরেট এবং অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট অফিসের দিকে চেয়ে দেখুন। মনে হবে সরকার যেন মনুস্মৃতির বিধান অনুযায়ী চলছে যে মনুস্মৃতি সম্পর্কে ব্রাহ্মণরা সর্বাধিক যত্নশীল এবং বৃটিশ আমলেও এর ব্যত্যয় হয়নি।

আমি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পারি যে, কংগ্রেস, স্বরাজ ও

রামরাজ—সব রাজই দ্রাবিড়দের দাস বানাতে সাহায্য করা ছাড়া কিছুই করে নি। দ্রাবিড়দের প্রতিযোগিতার ময়দান থেকে দূরে রাখতেই কি যোগ্যতার মানকে এত উঁচু করা হয় নি? মুসলমান, সাহেব ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রশ্ন নেই। আদি দ্রাবিড় যারা অন্যধর্ম গ্রহণের হুমকী দেয় তাদের জন্য স্বল্প যোগ্যতা চলে। কেন দ্রাবিড়দের আদি দ্রাবিড়দের সাথে এক করে দেখা হবে না? দিল্লীর ব্রাহ্মণ্যবাদী সরকারের নির্দেশেই রাজ্যের ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা দ্রাবিড় ছাত্রদের ভর্তি ও নিয়োগের ব্যাপারে উচ্চতর যোগ্যতার শর্ত আরোপের রণকৌশল গ্রহণ করেছেন। এটা কি প্রমাণ করেনা যে মনুধর্ম ও বিভীষণী বিশ্বাস-ঘাতকতার নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে?

প্রমোশান

পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে চাকরীতে প্রমোশনের প্রশ্ন। এতেও ব্রাহ্মণের ব্যবহার আপত্তিজনক। মিঃ ভেদাচলম এই বিষয়ের উপরে বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন। যথাযথ প্রমোশনের অভাবে নীচুস্তরের দ্রাবিড় কর্মচারীরা স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার সাথে আচরণ করেন। যদিও এদের কিছুলোক আমাদের সমর্থনেই চাকরী পেয়েছে কিন্তু তাদের প্রমোশনের জন্য ব্রাহ্মণ অফিসারের উপরই নির্ভর করতে হয়। ফলে তারা দাস হয়, বিভীষণ হয়, উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের হনুমান হয়। সরকারী চাকরী হোক আর রেলওয়ের চাকরীই হোক খুব কম তামিলই চাকরী পায় এবং এই দ্রাবিড়রাও আত্মমর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করেনা এবং এটা এজন্য নয় যে তারা নির্বোধ বরং এজন্য যে তারা সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণের দয়া, অনুগ্রহ ও আশীর্বাদের উপর নির্ভরশীল।

ব্রাহ্মণরা আর এক তন্ত্র প্রয়োগ করে। তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোন

পদের জন্য অপদার্থ অব্রাহ্মণকে নিয়োগ করে তাদের ছিদ্রান্বেষণ করার জন্য, তাদের অযোগ্যতা নিয়ে হৈচৈ করার জন্য এবং তার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার দোষারোপ করে থাকে শুধু এটা প্রমাণ করার জন্য যে অব্রাহ্মণরা বাস্তবিকই অপদার্থ। তারা এভাবে দ্রাবিড়দের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে যাতে তারা চাকরীবাকরীর ব্যাপারে সকল আগ্রহ-উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে এবং নীচু পজিশান নিয়ে সন্তুষ্ট রয়ে যায়। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন মন্ত্রীসভায় দুর্নীতিমুক্ত মন্ত্রী কে? তাহলে আমি বিনা দ্বিধায় বলবো অভিনাশিলিঙ্গম কিন্তু বুদ্ধিমত্তা, জাতিগত অনুভূতি, বাস্তব অভিজ্ঞতা, বর্ণস্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারে তিনি একাবারে খাজা।

তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাদের জনগণ যেন ইংরেজী না শিখে। অবশ্য তিনি প্রত্যেকের হিন্দী শিক্ষার উপর জোর দেন। স্কুল-কলেজে ভর্তির জন্য তিনি মিনিমাম মার্কের বেশীর উপর জোর দেন। তিনি বলেন, প্রার্থীর ভাল ইংরেজী জ্ঞান থাকতে হবে। তিনি ব্রাহ্মণের নির্দেশ মে তাবেক বলেন এবং তাকে যেখানে সই করতে বলা হয় সেখানে সই করেন। উচ্চপদে নিজেদের একচেটিয়া প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এসবই হচ্ছে ব্রাহ্মন্য কলাকৌশল।

আমাদের সাথে ব্যবহার

আমাদের সাথে ব্যবহার ব্রাহ্মণ অফিসাররা অধীনস্থ দ্রাবিড় কর্মচারীদের নিন্দা করে, অপদস্থ করে। তারা তাদের কাজে খুঁত ধরে ও তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মিঃ পোন্নামবলম ওরফে কানকাসবাই সালেম স্কুলে একজন তামিল পণ্ডিত। তার মধ্যে কিছুটা দ্রাবিড়বোধ ছিল। তিনি সংস্কৃতের মিশ্রণ ছাড়াই বিশুদ্ধ তামিলে কথাবার্তা বলতে পারেন। এতে ব্রাহ্মণরা চটা। এটা ছাড়া তিনি সম্পূর্ণ

দক্ষ ও সৎ। একদিন তিনি উত্তেজিতভাবে ক্লাসে আর্য ও দ্রাবিড়দের পার্থক্য বুঝাচ্ছিলেন যেহেতু পাঠ্যপুস্তকে এই বিষয়ের উল্লেখ ছিল। হেডমাষ্টার ছিলেন আর্য। তিনি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ক্লাসে ঢুকে শিক্ষককে নিন্দামন্দ করেন ও তাকে ক্ষমা চাইতে বলেন। পোন্নামবলম জবাবে বলেন তিনি কোন অন্যায় করেননি এবং ক্ষমাও চাইবেন না। বরং উল্টে তিনি তাকে ছাত্রদের সামনে তিরস্কার ও অপমানিত করার জন্য হেডমাষ্টারকে ক্ষমা চাইতে বলেন। হেডমাষ্টার ভোল পাল্টে শিক্ষকটিকে শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং বলেন যে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, সব ভারতীয়ই ভাই ভাই। পরে তিনি কতিপয় ছাত্রকে মিউনিসিপ্যাল কমিশনের কাছে এই মর্মে অভিযোগ করতে প্ররোচিত করেন যে, শিক্ষকটি সাম্প্রদায়িক ও বিভেদের বীজ বপন করছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনের ৭৫% অব্রাহ্মণ হলেও অধিকাংশই দাস মনোভাবাপন্ন। এখন এই তামিল শিক্ষককে বহিষ্কারের চেষ্টা চলছে। এইভাবে প্রতিটি প্রচেষ্টা চালান হয় দ্রাবিড়দের দাস বানাবার জন্য ও ব্রাহ্মণদের যুগ যুগ ধরে চলে আসা পজিশানকে শক্তিশালী করার জন্য। ব্রাহ্মণ কালেক্টররা অন্যের প্রতি অত্যন্ত অপমানজনক ব্যবহার করেন। কিন্তু কেন? কারণ সরকার তো মোটের উপর মনুর সরকার।

আদি দ্রাবিড় ও মুসলমানদের যদিও সমাজে সম্মানের চোখে দেখা হয়না কিন্তু দ্রাবিড়দের থেকে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়। এটা করা হয় চাকরীতে তাদের সংরক্ষণ থাকার জন্য। তারা যথাসময়ে তাদের প্রাপ্য পেতে বাধ্য। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের অভিযোগ তুলে ধরার সুযোগ আছে।

আমাদের অবশ্যই ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে

যতদিন না আমরা পঞ্চম কিংবা আদি দ্রাবিড় অথবা মুসলমান হচ্ছি ততদিন আমাদের এই লাঞ্ছনা ও লজ্জাজনক অস্তিত্ব থেকে মুক্তির কোন উপায় আছে বলে মনে হয়না। সভাপতি ভেদাচলম এ ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা আদি দ্রাবিড় ও মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত কেউ আমাদের সাহায্য করতে আসবে না। আমরা হয়তো মুসলিম হতে পারি কিন্তু আমাদের পক্ষে আদি দ্রাবিড় হওয়া অসম্ভব।"

এটা সত্য। আমরা আমাদের আদি দ্রাবিড় হিসাবে ঘোষণা করতে পারিনা যতক্ষণ না আমরা আদি দ্রাবিড় পিতা মাতার সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ না করি।

আমাদের জাতি সম্পর্কে মিথ্যা বলার জন্য আমরা শাস্তি পেতে পারি। যেহেতু আমরা জন্মলাভ করেই ফেলেছি, এখন আমরা আর অচ্ছুত হিসাবে জন্মলাভ করতে পারিনা। কেউ যদি আদি দ্রাবিড় পিতামাতার সন্তান হয়ও, ব্রাহ্মণরা তাকে শংকর আখ্যা দেবে। কিন্তু মুসলিম হওয়া সহজ। অরুণাচলম-এর নাম আব্দুল কাদের রাখলেই যথেষ্ট হবে। যদি কোন মুল্লাকে এক আনা দেওয়া হয় এবং তিনি '*Pathya*' পড়ে সংক্লিষ্ট ব্যক্তিকে কলমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' পড়িয়ে দেন তাহলে ধর্মান্তর হয়ে গেল। আমরা প্রায় কানায় (তীরের প্রান্তদেশ) মুখোমুখি হয়ে পড়েছি, যেখানে অন্য কোন পথ নেই।

প্রিয় সাথীগণ! গতকাল এই স্থানেই বিশ হাজার লোকের সমাবেশে আমি একই কথা বলেছিলাম। গতকাল সকালে মিউনিসিপ্যাল হলে ডঃ আম্বেদকর হোষ্টেলের বার্ষিক সভায় সভাপতির ভাষণে আমি এই

কথাই বলে ছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল একাজ করে আমি দ্রাবিড় জনগণের মধ্যে বদনামের ভাগী হয়েছি। আজকের সকালেও কিছুলোক আমাকে এই কথা বলেছে। আমার সাথে রয়েছে এমন কিছু লোকও আমার বিরুদ্ধে একই ধরণের বিষাক্ত অপপ্রচার করে চলেছে। কিন্তু এসব অভিযোগ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। সেই দ্রাবিড়দের সম্বন্ধেও আমার কোন মাথাব্যথা নেই যাদের কোন আত্মমর্যাদাবোধ নেই এবং তাদের জন্য আমি কোন মর্যাদাও চাই না। মিথ্যা বলে নাম কিনবার বাসনাও আমার নেই। আমি যে ব্যাপারে আগ্রহী তা হচ্ছে আত্মমর্যাদার বিকাশ এবং সেই নির্লজ্জ দ্রাবিড়দের মধ্যে মানবীয় মর্যাদা যাদের হিন্দুধর্মে শূদ্রহিসাবে বসবাস করতে হবে।

অচ্ছুতদের সৌভাগ্য

ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের কারণে আদি দ্রাবিড়রা আজ সৌভাগ্যের অধিকারী যিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, "আমি হিন্দু নই, পঞ্চমবর্ণও নই এবং হিন্দুদের কোন বর্গের মধ্যেও সম্পৃক্ত নই।" মন্ত্রীমহোদয় বলেন, 'আমাকে তালিকা দিন, আমি তোমাদের চাকরী দেব।' সর্দার প্যাটেল বলেন, 'আমি তোমাকে তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশও দেব।' গান্ধী বলেন, 'আমি আদি দ্রাবিড় ভাংগী।' এসবই সম্ভব হয়েছে ডঃ আম্বেদকরের এই আত্মঘোষণার ফলে যে তিনি হিন্দু নন। এখন এটা অষ্টক্ষরা মন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ১৯২৫ সালে কেবলমাত্র আমি একাই একথা আম্বেদকরকে বলেছিলুম। আমার পাঁচ বছর আগে বলা সেই কথা বলে তিনি এখন সাফল্যলাভ করেছেন। তিনি পুনরায় সাফল্যলাভ করবেন এইকথা বলে যে, আমি হিন্দুনই। এই মন্ত্রোচারণ করে আদি দ্রাবিড়রা (অচ্ছুতরা) আরও অনেক অধিকার লাভ করবে।

মুসলমানরা যে অধিকার লাভ করেছে, যে সব অধিকার তারা লাভ করবে তা একথা বলার জন্য যে, "আমরা হিন্দু নই। আমরা হিন্দু সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নই।" আমি ১৯৩৭ সালে দ্রাবিড়স্থানের দাবী করেছিলাম। জিন্নাহ সাহেব ১৯৪০ সালে পাকিস্তানের দাবী তুলেছিলেন। আজ পাকিস্তান তাঁর পদতলে। জিন্নাহ পাল্টা ঘা দিয়ে বলছেন, একে ঝকঝকে, পরিষ্কার, মসৃণ ও পবিত্র করে দাও।"

আজ নির্লজ্জ দ্রাবিড়দের ৪র্থ ও ৫ম বর্ণ হিসাবে অপদস্থ করা হয়। তাদের জারজ বলে হেয় করা হয়। তারা যথাযথ শিক্ষা সম্মান ও ধনসম্পদ ছাড়া চাকরবাকরের মত জীবনযাপন করে। তারা তাদের কাজের কোন মূল্য পায়না, এই শূদ্ররা সব মানবীয় মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে দাসের জীবনযাপন সন্তুষ্ট। কেন এই দুর্গতি? এ ছাড়া কি কিছু আছে যে, তারা তাদের হিন্দু বলে পরিচয় দেবে? আমি এই প্রশ্ন শুধু আপনাদের কাছে রাখছি না। আমি এই একই প্রশ্ন রাখছি স্যার আন্নামালাই ছেত্রি, স্যার আর. কে. সন্মুগম, স্যার এ রামস্বামী, বড় বড় জমিদার, মহারাজ, পাণ্ডারা, সন্নিধি, মারাই মালাই, আদিগল, ভারতীর সবার কাছে। এসব বড় কর্তাদের অবাস্তব মূল্যবোধের জন্য কি কোটি কোটি লোককে শূদ্রহিসাবে হিন্দুদের মধ্যে বাস করতে হবে?

বন্ধুগণ! আমাদের শূদ্র রোগ অত্যন্ত বড় ধরণের জটিল ব্যধি। এটা ক্যানসার। এ অত্যন্ত পুরানো রোগ। এর মাত্র একটা দাওয়াই আছে এবং তা হচ্ছে ইসলাম। এর অন্য কোন দাওয়াই নেই। অন্যথায় আমাদের দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে, ঘুমের বড়ি খেয়ে রোগ ভুলবার চেষ্টা করতে হবে অথবা রোগকে লুকোবার চেষ্টা করতে হবে এবং নিজেদের জ্যান্ত মড়া হিসাবে বহন করতে হবে। রোগ সারাবার জন্য মর্যাদাবান মানুষের মত উঠে দাঁড়ান, ইসলাম হচ্ছে একমাত্র পথ।

ইসলামের এ্যান্টিডোট বা প্রতিকার

অনুগ্রহপূর্বক ইসলামকে নবী মোহাম্মদের ধর্ম মনে করে অবজ্ঞা করবেন না কিংবা অবজ্ঞা করবেন না লুঙ্গিওয়ালা, দাড়িওয়ালাদের ধর্ম বলে যারা নিজেদের সহিবু, বাবুহর, মরাইকড় ও মোপালা হিসাবে পরিচয় দেয়। দ্রাবিড়দের ধর্ম নবী মোহাম্মদ, খৃষ্ট, বুদ্ধ কিংবা রাম, শিব, বিষ্ণুর মত আর্যদেবতাদের ধর্ম থেকে প্রাচীন। আরবী ভাষায় ইসলামের অর্থ শান্তি, আত্মসমর্পণ অথবা আনুগত্যজ্ঞাপন। ইসলামের অর্থ বিশ্বভ্রাতৃত্ব। এটাই সবকিছু। ১০০ অথবা ২০০ বছরের পুরোনো তামিল অভিধান দেখুন। তামিল-ভাষায় KADAVUL—ঈশ্বরকে নিরাকার একেশ্বর (one God) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, বর্ণনা করা হয়েছে শান্তি, একতা, আধ্যাত্মিক আনুগত্য ও অনুরক্তির (প্রতীক হিসাবে)। কাদাভুল হচ্ছে দ্রাবিড় ভাষা। এর অর্থ ইংরাজীতে 'গড' ও আরবীতে আল্লাহ। দ্রাবিড়দের আলাদা কোন ঈশ্বর ছিল না। কতকগুলো ধর্ম বিভূতি, নামা, তুফত ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু ইসলামকে মাথা নেড়া, দাড়ি কিংবা লুঙ্গির সাথে সম্পৃক্ত করা চলেনা। ভারতীয় মুসলমানরা ইসলামের জন্মদাতা নয়। তারা এর অংশ মাত্র।

মালয়ালী মোপলা, মিশর, জাপান ও জার্মানের মুসলমানরা হচ্ছে ইসলামের অপরাংশ। মুসলমানরা নিজেরা বিরাট গোষ্ঠী। আফ্রিকান, আবিসিনিয়ান ও নিগ্রো মুসলমানও রয়েছে। এই সমস্ত লোকের খোদা একটাই এবং এই খোদার কোন আকার-আকৃতি নেই, স্ত্রী, ছেলেপুলেও নেই। ইনি পান-আহারও করেন না। জন্মগত ভ্রাতৃত্ব, সমানাধিকার, শৃংখলা পরায়ণতা সাধারণ ব্যাপার। অন্যান্য পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে আবহাওয়া, জাতি ও কালগত। এই কারণেই দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে-

ছিটিয়ে থাকা ৬০ কোটি মুসলমান এক বিশ্বভ্রাতৃত্ব অনুভব করে। (এই) ইসলামের কল্পনা করতেই দুনিয়া কেঁপে ওঠে।

কিন্তু ১৫ কোটি হিন্দুর মধ্যে কি কোন 'কমন' জিনিস আছে? কোথায় মর্যাদা ও সম্মান? কোথায় ভ্রাতৃত্ব? কোথায় ঐক্য? কোথায় মানবতা ও শৃংখলা? রাগ করে বা উত্তেজিত হয়ে কি লাভ?

ধর্ম কি?

হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে ডঃ আম্বেদকর প্রথম বিজয়লাভ করেছেন। বর্তমান উত্তেজনার অবসানের পর তিনি যদি পুনরায় হিন্দু হিসাবে আবির্ভূত হন তাহলে তিনি আবার পঞ্চম হয়ে যাবেন।

জনগণ ধর্ম ছাড়া বাঁচতে পারেনা। ধর্ম বলতে আমি মানুষ ও দেবতার সম্পর্ক কিংবা মুক্তি, অদৃষ্টবাদ, ক্ষমা অথবা পরকালের পুরস্কার বুঝিনা। আমি যা বুঝি তা হচ্ছে প্রেম, অনুরক্তি, শান্তি, ভ্রাতৃত্ব সততা ঐক্যের মাধ্যমে মানুষের সাথে মানুষের পারস্পারিক মর্যাদা। আর এইসবই হবে বোধগম্য ভাষায়। আমি বলবো ধর্ম হচ্ছে জীবনব্যবস্থার এক মানবীয় আন্দোলন। তোমরা যদি একে ধর্ম বলো তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। এই ধরনের ধর্ম ছাড়া এই পৃথিবীতে মানুষের বাস করাই কঠিন। এই উ[illegible] নীতির উপর ভিত্তি করে দশকোটি মুসলমান রয়েছে, আমরা যদি তাতে ৪ কোটি দ্রাবিড়কে জুড়ে দিই, তাহলে আমরা অসাম্য, অমর্যাদা ও দাস-মনোভাব ধ্বংস করতে সক্ষম হবো। এতে ক্ষতি কি? যদি কেউ ব্রাহ্মণ্য জুলুম-যন্ত্রণা ও অমর্যাদার উপযুক্ত বিকল্প পেশ করতে পারে তবে আমি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

আমরা যদি দ্রাবিড়নাদে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করি তা হবে আমাদের

ইচ্ছানুসারে, মোল্লা-মৌলবীর মর্জী মোতাবেক নয়। আমি জানি আর দশটা দেশে ইসলাম কিভাবে চালু আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই দেশ শাসন করে। এটা ৩% ব্রাহ্মণদের কথা মতো হতে পারেনা যে অন্যদের বলে ব্রাহ্মণদের থেকে তাদের অবশ্যই দূরে থাকতে হবে কারণ শূদ্র বেশ্যার ব্যাটা। আমি এমন এক ধর্ম চাই যেখানে আছে সত্যিকার বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও শৃংখলা। এই প্রস্তাবে কারও আপত্তি থাকতে পারেনা।

আমি ইসলামের পক্ষে ওকালতি করছিনা। আমি ইসলাম প্রচারও করছিনা। কিন্তু এটা যে সত্য। আপনাদেব সবার সাথে তুলনায় মুসলমানদের সাথে আমার বিশেষ কোন বন্ধুত্ব নেই। আমি যা বলি তা হচ্ছে এই ব্রাহ্মণবাদের বিষাক্ত সাপকে মারতে হলে কিংবা এর দানবীয় ছোবল থেকে বাঁচতে হলে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র দাওয়াই।

যদি ইসলামকে ভালভাবে জানতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে মিশর ও তুরস্ক সফর করুন।

—:—

স্বাধীন ভারতে দ্রাবিড়রা ক্রীতদাস

[আজ একশ্রেণীর লোক নিজেদেরকে বানর, হনুমানরূপে ভাবতে লজ্জা-বোধ না ক'রে গর্ব বোধ করে। যারা এটা করছেন তারা যে অপরের ক্রীড়নক হিসাবে নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংস করছেন একথা পেরিয়ার ই. ভি. রামস্বামী নাইকার দেশ স্বাধীন হবার প্রাক্কালেই ব'লে গিয়েছিলেন। দাসত্বসুলভ মনোভাবের কারণে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে বাবরী মসজিদ ভাঙার অভিযানে গত ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত তারা যা কিছু করেছে মনে হবে তা দেখার পর বোধ হয় এ প্রবন্ধ লেখা হয়েছে অথচ এটা ৪৩ বছর আগের রচনা। যারা প্রকৃত ব্যাপার অনুধাবন করতে চান তাদের জন্য এতে অনেক মূল্যবান তথ্য রয়েছে।—অনুবাদক]

আসন্ন স্বাধীনতা—স্বরাজম (স্বরাজ) আমাদের জন্য বিপর্যয়কর হতে যাচ্ছে। ৭৫% দ্রাবিড় জনগণকে হনুমান, বিভীষণরূপে থাকতে হবে। মিঃ অভিনাসলিঙ্গম এবং তার সমমতের দ্রাবিড় পণ্ডিতরা, তাদের ল্যাজে বাঁধা নাইটের (স্যার উপাধি) ঘণ্টা নিয়ে ব্রাহ্মণদের তালে তাল দিয়ে রামের ভজন গাইতে গাইতে নাচতে থাকবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রকিয়ায় ধ্বংস হওয়ার জন্য।

কি লজ্জা! আমার নিজের দেশে এবং আমার প্রদত্ত ট্যাক্সে আমার কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। যদি আমার সংরক্ষণ না থাকে, যদি আমার মানুষের মত শক্তি না থাকে তাহলে আর্যের পোঁ ধরে চলবো, আমার অধিকারের জন্য তার কাছে আবেদন-নিবেদন করবো, তার পুজো করবো, তার সামনে নাচতে থাকবো? কিছু দ্রাবিড় নিজেদের হিন্দু (শূদ্র) ব'লে জাহির ক'রে বাউণদের কথায় নাচতে প্রস্তুত এই কারণেই এমনটা করতে হবে এবং অন্যান্যদেরও এই দাসত্বের পথ অনুসরণ করতে হবে? এই কলংক থেকে মুক্তির জন্য ইসলাম (যার অর্থ আমি হিন্দু নই)

হচ্ছে সর্বোত্তম মন্ত্র। আমি এটা আজই বলছিনা, আমি ১৯১৯-২০ সাল থেকে বিগত ২৮ বছর যাবৎ একথা ব'লে আসছি। এতে আমার জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়নি কারণ এই অপমান-লাঞ্ছনার অপনোদনের অপর কোন পন্থা নেই।

আজ পর্যন্ত কোন ডাক্তার এই রোগের প্রতিষেধক কোন ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেনি। সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

তোমার ললাট লিখন কি ?

সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইবদের সাথে মুসলমানরাও যখন শিক্ষা ও চাকরীতে তাদের জন্য সংরক্ষণ আদায় করতে সমর্থ হবে তখন সব সুযোগ-সুবিধার ভাণ্ডারের একচ্ছত্র মালিক হবে ব্রাহ্মণরা। তখন মুসলিম, খৃষ্টান, আদি দ্রাবিড়রা বাদে বাদবাকী অব্রাহ্মণদের ভবিষ্যৎ কি হবে অন্যকথায় শূদ্ররা কোথায় থাকবে ? কেন্দ্রীয় পরিষদে দ্রাবিড়দের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। সেখানে আছে অচ্ছুত ও যাজক শ্রেণীর শংকরাচার্যদের প্রতিনিধি। শূদ্রদের রক্ষাকবচ কই ? চাকরীতে সংরক্ষণ আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আমাদের শূদ্রত্ব খতম করতে হবে। আমাদের এমন সমাজ গড়ে তুলতে হবে যেখানে বিশ্বাসঘাতক বিভীষণদের অস্তিত্ব থাকবে না।

এই লক্ষ অর্জনে হে আমার দ্রাবিড় ভায়েরা আমাকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন সমাধানসূত্র দিন। আপনাদের এখনই আমি সমাধান দিতে বলছিনা। বাড়ীতে যান, আপনাদের নেতাদের সংগে ইংরাজী শিক্ষার বদৌলতে উচ্চপদপ্রাপ্ত স্বল্পসংখ্যক খেতাবধারীদের সংগে পরামর্শ করুন এবং তারপর একটা সিদ্ধান্তে আসুন এবং আমাকে তা আগামীকাল জানান। আমার কথা ধৈর্যসহকারে শোনার জন্য আমি সত্যই কৃতজ্ঞ। আপনাদের শতসহস্র অভিনন্দন।

কেন ইসলাম গ্রহণ করবেন ?

[১৯৪৭ সালের ১৮ই মার্চ ত্রিপুরাপল্লীতে যারা ই. ভি. রামস্বামীর বক্তৃতা শুনেছিলেন কিংবা সাপ্তাহিক Kudu Arasu-তে প্রকাশিত তাঁর বক্তৃতা পড়েছিলেন তাদের অনেকেই তাদের সন্দেহ ও আপত্তির কথা হয় সম্পাদক অথবা পেরিয়ারকে লিখেছিলেন এবং কেউ কেউ এ ব্যাপারে তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য ও ব্যাপারটাকে আরও স্পষ্ট করার জন্য পেরিয়ার পত্রিকায় নিম্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন।]

অনেক বন্ধু আমাকে জ্ঞান দিতে অথবা আমার দৃষ্টিভংগীর বিরুদ্ধে আমাকে সতর্ক করতে পত্র লিখেছেন। আমি আমার বন্ধুদের এবং অন্যান্যদের ক্রোধান্ধ অথবা বিদ্বেষান্ধ না হয়ে এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীর শিকার না হয়ে এটা পড়বার জন্য অনুরোধ করি।

ভারতে হিন্দুদের মুসলিম-বিদ্বেষের কারণ তাদের ইসলামবিদ্বেষ। মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম মূলগতভাবে আর্যবিরোধী (হিন্দুবিরোধী) এবং এজন্য হিন্দুরা একে ঘৃণা করে। ইসলাম আর্যবিরোধী কারণ এটা আর্যবাদের মৌল ভিত্তিকেই নড়িয়ে দেয়।

আর্যধর্ম বা হিন্দুধর্মের বহু দেবতা। প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব আকার-আকৃতি, নামধাম ও তারা একে অপর থেকে আলাদা। হিন্দুরা বহুবর্ণে ও বিশ্বাসে বিভক্ত। বর্ণের ভিত্তি অসমতা যেমন ব্রাহ্মণ (উচ্চবর্ণ), শূদ্র (নিম্নবর্ণ) প্যারিয়া (অচ্ছুত)। আমরা অচ্ছুতদের দলে সামিল।

ইসলামের রয়েছে একটা ঈশ্বর এবং তার কোন আকার আকৃতি নেই। সেখানে নেই কোন বর্ণভেদ, বিভেদ, ছোট-বড় ব্যবধান। জন্মের কারণে

সেখানে কেউ ছোট বড় নয়। ইসলামে উত্তম, মধ্যম ও অধম বলে কিছু নেই।

অত্যন্ত সংক্ষেপে ইসলামের রয়েছে এক আল্লাহ্, এক বর্ণ, এক গোষ্ঠী। আর এটাই হচ্ছে দ্রাবিড়দের মৌলিক নীতি এবং এর প্রয়োজনও।

শের্কের বা বহুত্ববাদের কারণে আর্যরা অনেক সুখসমৃদ্ধি লাভ করেছে। পক্ষান্তরে দ্রাবিড়রা লাভ করেছে বহু খারাবী, অমর্যাদা ও অসম্মানজনক কাজ। এইসব গুরুকারণের জন্য ব্রাহ্মণরা ইসলামকে ঘৃণা করে। কারণ ইসলামে রয়েছে শূদ্র ও প্যারিয়ারদের অবস্থার উন্নয়নের সমাবেশ।

যদি সব লোক ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে দেশে জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ থাকবেনা, থাকবেনা বহু দেবতা ও মূর্তির স্থান। দেবতাদের ভোগের ব্যয়কৃত অজস্র অর্থও বেঁচে যাবে। এসবের জন্য বহুকাল ধরেই ব্রাহ্মণরা কঠোরভাবে ইসলাম বিরোধী। এজন্যই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যার অভিযান চালায় হিন্দুদের মনকে বিষাক্ত করার জন্যে। আর্যদের ভৃত্য অর্থাৎ শূদ্ররাও এই ইসলামবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে এবং তারফলে সাধারণভাবে মুসলমানদের ঘৃণা করতে শিখেছে।

কিন্তু ঐ হিন্দুই খৃষ্টান, শিখ, আর্যসমাজ, ব্রহ্মসমাজ, বৌদ্ধদের অত তীব্রভাবে ঘৃণা করেনা যতটা তীব্রভাবে ঘৃণা করে ইসলামকে। বাস্তব অবস্থা এই যে, হিন্দুদের মতই এইসব ধর্ম ইসলামকে ঘৃণা করে। নানা-কারণে ইসলাম বিদ্বেষের ব্যাপারে তাদেব মধ্যে ঐক্যমত দেখা যায়। কতক ব্রাহ্মণ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে এবং কতক সানন্দে খৃষ্টান প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। ধর্মান্তরিত হিন্দু, খৃষ্টান ও শিখ হওয়ার পরও অবাধভাবে তাদের নয়া ধর্মে পুরানো জাতিভেদ প্রথা মেনে চলে। শিখেদের ব্যবহার

তো প্রায় হিন্দুদের মতোই। বহু মূর্তির পূজার পরিবর্তে শিখেরা তাদের পবিত্র-গ্রন্থের পূজা করে। শিখেরা বহুল পরিমাণে হিন্দু-বর্ণবাদের অনুসারী। শিখ সমাজেও অচ্ছুত আছে। শিখ অচ্ছুতদেরও কনশেসান স্বরূপ সংরক্ষণ প্রথার সুযোগ দেওয়া হয়, শিখেদের মধ্যে বহু উপদলীয় কোন্দলও রয়েছে। কিন্তু আর্য পত্রিকাসমূহ এসব নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়না। পাঞ্জাব সফরের সময় আমি এসব জানতে পেরেছি।

আমাদের দেশের খৃষ্টানদের মধ্যে অচ্ছুত খৃষ্টানও রয়েছে। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যককে কিছু শিক্ষা ও শিক্ষকতার চাকরীও দেওয়া হয়েছে। ব্যাস, এই-ই সব। খৃষ্টানরা তাদের সাথে সে ব্যবহার করেনা যে ব্যবহার তারা মুসলমানদের সাথে করে। এই-ই সেই কারণ যেজন্য আর্যরা খৃষ্টান ও শিখেদের প্রতি এক ধরণের বন্ধুত্ব অনুভব করে। বৌদ্ধ ও জৈনরাও সমানভাবে ইসলামবিরোধী হওয়ায় আর্যরা ইসলামবিরোধিতায় তাদের সাথে সখ্যতা অনুভব করে। এই ইসলামবিদ্বেষের ভিত্তি আত্মস্বার্থ, আত্মগর্ব ও বর্ণভিত্তিক স্বার্থ হওয়ায় শূদ্রা যারা মূলত ব্রাহ্মণদের গোলামমাত্র ব্রাহ্মণদের সংগে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধিতায় সোচ্চার। মুসলিমবিদ্বেষ ছাড়া কেউ কি বলতে পারে যে ব্রাহ্মণরা হিন্দুধর্মের শিক্ষা, জ্ঞান ও নীতি ইত্যাদি প্রচারে আগ্রহী ?

ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা কে ? বুদ্ধ ও খৃষ্টের মত অন্য সংস্কারকের দ্বারাও এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলাম তৈরী হয়েছিল কেন ? শের্ক বা বহুদেববাদ, জন্মের ভিত্তিতে কৌলিন্য ভেঙ্গে দিয়ে আল্লার একত্ববাদ মূর্তিপূজা ও সমস্ত কুসংস্কার মুক্ত একটা দল তৈরী করতে ও তাদের যুক্তিপূর্ণ জীবনধারার পথে পরিচালিত করতেই ইসলামের জন্ম হয়েছিল। এমনকি যদি আমরা একে আরবীয় অথবা তুর্কী ধর্ম বলি, তাহলে আমাদের মত পুরোনো ধর্মকে দ্রাবিড় ধর্ম বলা অন্যায় হবেনা। যা কিছু

প্রয়োজন তা হচ্ছে জনগণকে পরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথা, লাঞ্ছনাময় অবনমন, অসংখ্য দেবতা এবং সংস্কার, মূর্তিপূজা থেকে উদ্ধার করা। বুনিয়াদী লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্রাহ্মণ পৌরহিত্যবাদ থেকে মুক্তি। এটা দ্রাবিড়দের বোঝা দরকার।

লজ্জা ও অপমান

একজন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বন্ধুত্ব প্রদর্শন এমনকি গোলামী করতেও রাজী পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ বিনা দ্বিধায় তার প্রতি নীচ শূদ্র হিসাবে আচরণ করে। আমি যদি সেই দ্রাবিড়কেই মুসলমানের প্রতি ভালবাসা বন্ধুত্ব প্রদর্শনের জন্য বলি তাহলে ক্ষতি কোথায় যখন মুসলমানরা দ্রাবিড়দের প্রতি শূদ্র হিসাবে নয় ভাই হিসাবে ব্যবহার করতে প্রস্তুত? জনতার ৩% ব্রাহ্মণের সাথে নীচ দাস হিসাবে জীবনযাপনের চেয়ে জনতার ১০% মুসলমানের সাথে ভাই হিসাবে বাস করা কি অনেক বেশী সম্মানজনক নয়? অথচ তা ঘটছেনা কেন? কারণ হলো ব্রাহ্মণ্য-বাদ আমাদের মগজধোলাই করে মুসলমানদের দৈত্য-দানব ও বর্বর পশু আখ্যা দিয়ে তাদের ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। ইসলামে এমনকি খারাপ জিনিস আছে যা আমাদের মধ্যে নেই? এমনকি ভাল জিনিস যা আমাদের মধ্যে আছে অথচ ইসলামের মধ্যে নেই? আমাদের মধ্য থেকে মন্দ দূর করার ব্যাপারে সংস্কারসাধনের পথে ইসলাম কি কখনও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে?

যদি ডাক্তার পরামর্শ দেন যে, রোগীর হাত কেটে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই তাহলে বাঁচার জন্য আমরা তাতে রাজী হই। যদি ডাক্তার বলেন যে কোন আত্মীয় স্ত্রীলোকের জরায়ু কেটে ফেলা একান্তই জরুরী তাহলেও আমরা তাতে রাজী হয়ে যাই। অন্যকথায় জীবনে বাঁচার জন্য আমরা আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংগ-প্রত্যঙ্গ ছেদ করতে প্রস্তুত হই। কিন্তু যখন একটা ভণ্ড গোষ্ঠী আমাদেরকে প্রতারিত করে আমাদের

উপর কৌশলে অথবা শক্তির জোরে দাসত্ব চাপিয়ে দেয় তখন তা থেকে মুক্তির জন্য এত ভাবনাচিন্তা, দ্বিধা, আপত্তি, সংকোচে বাধা থাকবে কেন? যারা আমাদের মতের বিরোধী তাদের আমাদের দেহমনের এই গোলামী থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শনের বিকল্প পেশ করার জন্যও প্রস্তুত থাকা উচিত। যদি তারা তা না করে তবে তার অর্থ তারা অজ্ঞ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধ।

হিন্দুধর্ম ত্যাগ করুন

আমার প্রিয় ক্রোধান্বিত বন্ধুগণ! বেদশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস পুড়িয়ে আমরা আমাদের শূদ্রত্ব খতম করতে পারবো না।

মন্দির, মূর্তি ভেঙ্গেও আমরা শূদ্র ছাপ দূর করতে পারবো না। ব্রাহ্মণরা জানে কেমন করে কুপোকাৎ করতে হয়। এমনকি যখন কেউ ঘোষণা করে যে সে হিন্দু নয় তখনও শূদ্র ছাপ যায়না। হিন্দুধর্ম সহজে যাবেনা। এটা সে ধরণের ধর্ম নয় যে একে কম্বলের মত খুলে ফেলবেন। একে শেষ করতে হলে আমাদের ও আমাদের পৌত্র-পৌত্রাদির জীবনও যথেষ্ট হবেনা।

আমাদের লাঞ্ছনা ও দাসত্ব থেকে মুক্তির একটাই পথ আর তা হচ্ছে আমাদের জীবদ্দশায় হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করা। যদি এভাবে আমরা হিন্দুধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্ত হই তাহলে আমাদের জন্য নতুন নাম উদ্ভাবন করতে হবে। বর্তমান গান্ধী সরকারের কাছ থেকে এই নামের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে হবে। এজন্য নবতর আইন, জনমত ও সাংঘাতিক প্রচারণা প্রয়োজন। আইন পরিষদসমূহে আমাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। ব্রাহ্মণের কঠিন বিরোধিতা ও বানিয়ার অর্থের মোকাবিলায় এটা করতে হবে। এই পরিবর্তন কার্যতঃ অসম্ভব। এই সমস্ত কাঠিন্যের মুখে এটা কি উত্তম নয় যে এমন কোন ধর্ম ও আন্দোলনে সামিল হওয়া যা আমাদের পুরাতন দ্রাবিড় নীতিসমূহের সাথে সংগতিশীল এবং যা দুনিয়ার অধিকাংশ স্থানে স্বীকৃত? এই সমস্যার উপর আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করুন।

ইসলামের নাম শুনলে আপনারা ক্ষেপে যান কেন? হিন্দু ধর্মের নাম বিগলিত হয়ে পড়েন কেন? আপনাদের প্রথমেই এই রহস্যের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অন্যথায় এমন এক পন্থা বার করুন যার দ্বারা আপনারা এই নির্লজ্জ শূদ্রত্বের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন? আমি আমার উপলব্ধির কথা বলছি। অবস্থার উপর আপনি আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। আমাদের জীবদ্দশায় এই বিষয়ের পক্ষে বিপক্ষে বিতর্ক শুরু হোক। অন্যথায় আমরা সমস্যা এবং আমাদের পুত্র-পৌত্রাদির জন্য অপমান, লাঞ্ছনা, দাসত্ব লজ্জা রেখে যাব। আমরা যদি আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থায় মারা যাই তাহলে তাতে ব্রাহ্মণ পুরুতদেরই লাভ কারণ সে শূদ্রত্ব থেকে ফায়দা ওঠাবে এবং মাসিক, বার্ষিক শ্রাদ্ধশান্তির নামে অর্থশোষণ করবে। বাউনের পক্ষে পরিবর্তনের পক্ষে কাজ করা অভিশষ্যমূলক। পক্ষান্তরে সে শোষণের স্বার্থেই শূদ্রদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেবে। সেজন্য আমার আবেদন ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি দাসত্বসুলভ ভক্তি-শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করুন এবং মানসম্মানের সংগে বাঁচার পথ বার করুন। আমার উপর রাগ করার কোন যুক্তি নেই।

এই বিরাট সামাজিক সমস্যার সমাধান না করে যদি আপনারা হিন্দু-মুসলিমকে পারস্পরিক ঘৃণা লড়ায়ের জন্য রাস্তায় ছেড়ে দেন তাতে ক্ষতি হবে দ্রাবিড়দের। ব্রাহ্মণদের কোন ক্ষতি হবে না পক্ষান্তরে তারা এই দ্বন্দে লাভবান হবে। ইহজীবনের আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য একদফা ও পরজীবনের মুক্তির জন্য নানাধরণের সেকেলে কুসংস্কারপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর এক দফা খাজনা আদায় করবে। মনে

রাখতে হবে যে এইসব আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর্যরা আমাদের জনগণকে সম্পূর্ণরূপে গোলাম ক'রে ফেলে আমাদের উপর শূদ্রত্বের নীচত্বের বোকামীর ছাপ করে দিয়েছে। অনুগ্রহ করে ব্যাপারটার উপর ভাবুন।

শূদ্র হওয়ার জন্য লজ্জিত

শূদ্র ব্যাধির সর্বোত্তম দাওয়াই ইসলাম। এই বক্তব্যকে পেরিয়ার ত্রিচি, কুম্ভকোনাম এবং অন্যান্য স্থানে তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। গোটা পরিকল্পনাটারই সমালোচনা করে এক ব্রাহ্মণ ব্যক্তি পেরিয়ারকে পত্র লেখেন। পেরিয়ার নিম্ন জবাব পাঠান।

প্রিয় বন্ধু,

১৯৪৭ সালের ২৬শে মার্চে লিখিত আপনার পত্র আমি দেখেছি। আপনার নাম ঠিকানা উল্লেখ না করার জন্য আমাকে মাফ করবেন। আপনার গালাগালিপূর্ণ ভাষার জন্য আমার কোন মাথাব্যাথা নেই। ব্রাহ্মণ্যবাদকে আমি ডরাই না। ব্রাহ্মণ্যবাদের শুঁড়ে আকর্ষিত হয়ে এই আধুনিক যুগেও শূদ্রের তকমা পরার জন্য আমি লজ্জিত। আপনি যদি আপনার শূদ্রত্বের জন্য দুঃখী না হন তাহলে আমি নিশ্চিত যে, আপনিও স্বাভাবিকভাবে লজ্জানুভব করবেন।

এটা আমার কাছে সমান ভাবে সেই মানুষ নোয়াখালি, বাংলা অথবা পাঞ্জাবে মরছে। ঐ সমস্ত স্থানের অমুসলমানরা তাদের শূদ্রত্বের জন্য লজ্জিত নয়। শূদ্র হয়ে জন্মাবার জন্য তাদের কোন উদ্বেগই নেই। অসম্মানের সাথে বেঁচে থাকার চেয়ে সম্ভবত মরে

বাধ্য হয়ে তারা ... ও শূদ্রত্ব স্বীকার করেছিল। আমি তাদের ইসলাম গ্রহণ করার উপযুক্ত বিবেচনা করেছি। যারা নিজেদের শূদ্রত্বের জন্য লজ্জিত এবং যারা এই লজ্জা থেকে মুক্তি চায় (তারা যতদিন হিন্দু থাকবে ততদিন এটা থাকবে) তাদেরই ইসলাম অথবা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তাদের প্রকৃত স্বার্থ দাবী করবে। যারা শূদ্রত্বের জন্য লজ্জিত নয় তারাই আমার আবেদনে সাড়া দেবে না। ... যদি হিন্দুধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মপথ থাকে তবে তা জনতার সামনে তুলে ধরা উচিত। কিন্তু অর্থহীন বেদান্তের কথা বলে লোককে পথভ্রষ্ট করবেন না এবং লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির পথে তাদের বাধা দেবেন না। ইসলাম গ্রহণে লজ্জা কেন? ইসলামের অধীনে অপবিত্র গোলাম হয়ে থাকবে কি আপনার বিরুদ্ধে চীৎকার করবে? ভারতের ৯ কোটি মুসলিমের মধ্যে ১ কোটি নিম্নবর্ণের হিন্দু। মাদ্রাজ প্রদেশের ৫০ লাখ মুসলমানের মধ্যে ৪০ লাখ আগে ছিল হিন্দু, দ্রাবিড়। এই মুসলিমরা কি কারও দাস? তারা কি তাদের অবস্থার জন্য লজ্জিত? তারা কি পাবলিক সার্ভিসে জজেদের তালিকায় ও অন্যান্য পেশায় কমবেশী সংখ্যানুপাতে নিজেদের হিস্যা ভোগ করছে না? স্বাধীনতা আন্দোলনকালে তারা জেলে যাক অথবা না যাক প্রত্যেক নির্বাচিত অথবা অনুমোদিত কমিটিতে তাদের দেখা যায়।

হে দ্রাবিড় ও আদি দ্রাবিড়গণ। জীবনে আপনাদের এই নিম্নমানের জন্য কি কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মই দায়ী নয়? লজ্জিত, ব্যথিত, আহত হওয়ার পরিবর্তে, আত্মমর্যাদা জানাবার জন্য সবকিছু

করার পরিবর্তে আপনিই আমাকে এই ঔদ্ধত্য দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন যে, 'আমার কি কোন লজ্জা নেই?' আপনার কাছে ইসলাম প্রচারের জন্য আমার উপর দোষারোপ করা কি যথাযথ, যুক্তিসংগত ও বিবেকসম্মত? আমি হিন্দু যুবকদের ক্রোধান্বিত করে তুলেছি একথা আপনি বলার দুঃসাহস পেলেন কোথা থেকে?

আমি জানি আধুনিক যুবসমাজ যুক্তি ও আত্মমর্যাদা পক্ষপাতী। আগামী বংশধররা আমার কাজের মূল্য অনুধাবন করবে অন্ততঃ গভীরভাবে আমার স্বাধীনতার সমাধান বিবেচনা করবে। আমি আমার জীবন কিংবা মৃত্যু সম্পর্কে ভীত নই। সত্যের জন্য সত্যপথের জন্য আমি সবকষ্ট স্বীকার করতে রাজী আছি।

নবী মোহাম্মদ যখন সত্য প্রচারে ব্রতী হন তখন তিনি তাঁর স্বদেশবাসীদের সাংঘাতিক আক্রমণের শিকার হন। জাহেল জনগণ এমনকি খৃষ্ট, বুদ্ধকে নিন্দা করে। অবস্থা যেখানে এই সেখানে আমার মত লোক যদি সেই সত্য তুলে ধরে তাহলে লোকের পক্ষে আমাকে সমালোচনা করা অস্বাভাবিক নয়।

এটা সত্য যে, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী সকলেই কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ কোরবান করেছেন ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং সেজন্য তাঁরা জনগণের ভালবাসা ও প্রশংসা পাবার হকদারও। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর যখন সমাজ সংস্কারে তাদের অবদানের মূল্যায়ন করা হবে তখন এ প্রশ্ন উঠবে যে তারা আপনাদের ধর্মীয় ও সামাজিক গোলামী থেকে মুক্ত করতে কি কাজ করেছেন? তাদের প্রতি

প্রদর্শিত সকল সম্মান সত্ত্বেও প্রশ্ন রয়ে যাবে যে তাঁরা আপনাদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য কি করেছেন? তাঁরা যা কিছু করেছেন পুরোনো ব্যবস্থাকে ধরে রাখতে ও স্থায়ী করতেই করেছেন।

স্যার আন্নামালাই ছেত্রীর আছে ১০ কোটি, বিড়লার রয়েছে ৪০ কোটি, হায়দ্রাবাদের নিজামের রয়েছে ৪০০ কোটি এই কথা বলা ছাড়া সাধারণ মানুষের সেবায় তারা কিছু করেছেন এমন কথা কি বলা যাবে? ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বাধিক চতুর ব্যক্তি হিসাবে প্রশংসিত চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী শূদ্রদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কি করেছেন? ভারত থেকে সাদাদের তাড়িয়ে আপনারা কি পেয়েছেন? যে মুহূর্তে শ্বেতাংগরা প্রস্থান করবে সেই মুহূর্তেই জন্ম নেবে পাকিস্তান। আপনাদের জন্য শুধু শূদ্রস্থান। আমার কথা শোনা কি আপনাদের জন্য লাভদায়ক নয়? মহাকাল কি আমার কাছ থেকে কিছু পাবে না? এটা কি আমাকে সন্তোষ প্রদানও করবে না?

কিছু হিন্দু নেতা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা প্রচারণা অব্যাহত রেখেছেন যে মুসলমানরা জোর করে হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করছে এবং যুব সমাজের মনকে বিষিয়ে দিচ্ছে। আমি কি হিংসার প্রচার করি? আর্যরাই অন্যদের জোর করে অধর্মে ধরে রাখে। হিংসার পথ পরিক্রমা করার শক্তি আমার নেই। এ পর্যন্ত কেউ তো বলেনি যে তাকে জোর করে মুসলমান করে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। এমনকি গান্ধীর ছেলে আবদুল্লাহ গান্ধী স্বেচ্ছায়

হিন্দুধর্মে ফিরে এসেছেন তখন বরং বলা হয়েছিল আবদুল্লা গান্ধী টাকা পেয়ে পুরোনো ধর্মে ফিরে গেছেন।

স্বরাজ সরকারের অধীনে হে দ্রাবিড় জনগণ তোমাদের কোন আওয়াজ থাকবে না। গণপরিষদে তোমাদের হয়ে কথা বলবার কেউ নেই। এশিয়ান জাতিসমূহের মাঝে তোমার কোন স্বতন্ত্র গোষ্ঠী পরিচয়ও নেই। এই ধরনের দুঃখজনক পরিস্থিতিতে ইসলামের নাম শুনলে তোমরা ক্ষেপে যাও কেন? গান্ধীজী বলেন কোরান ও গীতা এক। তিনি বলেন রাম-রহিমও এক। তিনি বলেন রাম-রহিমের নাম উচ্চারণ করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়বেন। যদি এই দুটি নাম একই অনুরক্তির সাথে উচ্চারিত না হয় তাহলে আমি কেমন করে নোয়াখালির হিন্দু ও বিহারের মুসলমানদের সম্মুখীন হতে পারি (১৯৪৭ সালের ৫ই এপ্রিলের তামিল দৈনিক দিনমণি দ্রষ্টব্য)।

এমতাবস্থায় যখন দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধী নিজেই প্রচার করছেন যে ইসলাম ও হিন্দুধর্ম এক এবং রাম-রহিমও একই তখন দলিতদের নির্যাতিতদের আমি যদি সেই ইসলাম গ্রহণ করতে বলি যে ইসলাম আমাদের কাম্য সাম্য ও যুক্তিজ্ঞানের প্রচারক তাহলে দোষ কোথায়? আজ পর্যন্ত আমি এই সত্য প্রচার করে এসেছি যে, যারা মনেপ্রাণে চান যে অস্পৃশ্যতা খতম হয়ে যাক এবং অস্পৃশ্য ব'লে কোন গোষ্ঠী না থাকুক তারা সহজেই ইসলামে প্রবেশ

করতে পারেন। এই বিপ্লবাত্মক ধারণা কিছু লোকের মধ্যে গৃহীতও হয়েছে।

কেরালীয় (ত্রিবাঙ্কুর কোচিন) আমি ১৯২৪ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত দশ বছরের অধিককাল ধরে এই কথা প্রচার করে আসছি যে, ইজহাভা ও অন্যান্য অচ্ছুতদের হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। এই উপদেশ গ্রহণ করে সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাতে প্রস্তাবও পাশ হয়েছে। দু' থেকে তিন হাজারের মত মালয়ী ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং হিন্দুধর্ম তাদের উপর লাঞ্ছনার যে স্তূপ চাপিয়েছিল তাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। সেই সংগে হিন্দু সমাজের অসংগত চেষ্টা উপলব্ধি করে সরকার ও সমাজ অচ্ছুতদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য অনেক পদক্ষেপ নিয়েছেন। ধর্মান্তরের হুমকী সংস্কারের প্রচারণার ঠেলায় ত্রিবান্দ্রম মন্দিরে প্রবেশ এবং কোচিন কলেজে এবং চাকুরীতে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সমত্ব হয়েছে।

ডঃ টি. এস. এস. রাজন নামে জনৈক ব্রাহ্মণ অচ্ছুতদের মন্দিরে প্রবেশের ব্যাপারে সম্প্রতি মাদ্রাজ বিধানসভায় এক প্রস্তাব এনেছেন। তিনি বলেছেন, হিন্দু সমাজের দুর্বলতা ও অধোগতি নিবারণের জন্য তিনি এই প্রস্তাব এনেছেন। তিনি বলেননি যে লোকে পূজাপাঠ-প্রার্থনা, প্রসাদ, ভক্তির মাধ্যমে পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে যাবে। এর অর্থ কি? তারা চায় যে দ্রাবিড়রা চিরকাল শূদ্র থাকুক এবং অচ্ছুতদের শূদ্রের স্তরে তোলা হোক, তার বেশী কিছু নয়।

আমি কেবল তাদেরকে বলছি যারা শূদ্র হওয়ার জন্য লজ্জিত ও আত্ম গ্লানির শিকার। আমি তাদের বলছি না যারা নিম্নবর্ণ হওয়ার জন্য মর্মবেদনা অনুভব করে না। আমার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য যারা আমার সমালোচনা করেছেন এবং যারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমায় নিন্দিত করেছেন আমি আশা করি যে তারা সমস্যাটি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন।

———

প্রকাশক :
এস. এম. ইবরাহিম
৬৩, মফিদুল ইসলাম লেন
কলিকাতা—১৪

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর ১৯৮৯

মূল্য : ৫·০০

মুদ্রণে :
বি. আই. পি. টি. প্রেস
২৭বি, লেলিন সরণী
কলিকাতা—১৩